بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ই জুলাই, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কিছুকাল পূর্বে এক খুতবায় আমি উল্লেখ করেছি যে, এ বছরটি জামাতে কর্মকর্তা নির্বাচনের বছর। এ পর্যন্ত বেশিরভাগ জায়গায়ই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, দেশীয় পর্যায়েও আর স্থানীয় জামাতগুলোতেও। আর নতুন কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। কর্মকর্তাদের মাঝে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় নতুন আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং ওহদাদার বা কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু অনেক স্থানে যারা পূর্বে কাজ করে আসছিল তাদেরকেই পুনরায় নির্বাচন করা হয়েছে। নবাগতদের যেখানে এ জন্য খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, খোদা তা'লা তাদেরকে জামাতের সেবার জন্য নির্বাচন করেছেন সেখানে বিনয়ের সাথে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়ে খোদার সাহায্যও যাচনা করা উচিত যেন তারা এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে যা তাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব কর্মকর্তাগণ পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরও যেখানে খোদার দরবারে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুনরায় খিদমতের সুযোগ দিচ্ছেন সেখানে খোদার দরবারে এই বিনয়াবনত দোয়াও করা উচিত যে, খোদা তা'লা তাদেরকে নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করে আমানতের এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন আর অতীত খিদমত বা পূর্বের বছর কাজ করতে গিয়ে যে আলস্য এবং উদাসীন্য প্রকাশ পেয়েছে যার কারণে তাদের ওপর ন্যাস্ত আমানতের প্রতি তারা সত্যিকার অর্থে সুবিচার করতে পারে নি বা দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় নি, আল্লাহ্ তা'লা সেই ত্রুটি বিচ্যুতিকেও মার্জনা করুন আর নিজ অনুগ্রহ বশত আগামী তিন বছরের জন্য খিদমত বা সেবার যে সুযোগ দিয়েছেন এবং যেসব আমানত তাদের ওপর ন্যাস্ত করেছেন এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও যেন কোন আলস্য ও উদাসীন্য প্রদর্শিত না হয় এবং আমানতের প্রতি সুবিচার করার তৌফিক যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের দান করেন বা আমানতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের যেন তৌফিক দান করেন।

স্মরণ রাখা উচিত যে, জামাতী খিদমত বা জামাতের সেবা করার যে সুযোগ এটিকে ভাসা দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় এবং তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি সে ওহদাদার বা কর্মকর্তা হোক অথবা সাধারণ এক আহমদী হোক, তার এ অঙ্গীকার রয়েছে যে, সে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে। কোন ব্যক্তি ওহদাদার বা কর্মকর্তা হিসেবে যখন কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে বা কোন দায়িত্ব যখন তার ওপর ন্যস্ত হয় সেক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে তার ওপর এই দায়িত্ব বেশি বর্তায় যে, সে এই অঙ্গীকার রক্ষা করবে। আর স্মরণ রাখতে হবে যে, সে এই অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লার সাথে করেছে। আর অঙ্গীকার রক্ষার কথা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন, অঙ্গীকারের প্রতি সুবিচার করার ওপর বেশ কয়েক জায়গায়

গুরুত্বারোপ করেছেন। সুতরাং সদা স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তোমাদের ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব যা তোমরা শিরোধার্য কর তাও তোমাদের অঙ্গীকার। সুতরাং নিজেদের আমানত এবং অঙ্গীকার রক্ষা কর, এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা যারা নিজেদের কথায় সত্য এবং তাকওয়ার ওপর বিচরণকারী তাদের লক্ষণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا (সূরা আল্-বাকারা:১৭৮) অর্থাৎ যখন কোন অঙ্গীকার করে তখন তারা তা পূর্ণ করে বা রক্ষা করে। অতএব যারা জামাতী দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় তাদের এটি একটি মৌলিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তারা সবসময় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এবং তাকওয়ার মানকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় রত থেকে দায়িত্ব পালন করে। তাদের সত্যের মানে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, তাদের তাকওয়ার মান যদি জামাতের এক সাধারণ সদস্যের জন্য আদর্শ স্থানীয় না হয় তাহলে সে নিজের অঙ্গীকার, নিজের পদ এবং আমানতের দায়িত্ব পালনের প্রতি সচেতন নয় বা মনোযোগী নয়। সুতরাং আমীর বা সদর বা প্রেসিডেন্টরা সর্বপ্রথম নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, আমেলার সামনেও আর জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের সামনেও। যারা সেক্রেটারী তরবীয়ত তাদের ওপর তরবীয়তের দায়িত্ব ন্যাস্ত রয়েছে। তরবীয়তের দায়িত্ব তখনই সঠিকভাবে পালিত হতে পারে যদি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। যে কর্মী, যে দায়িত্বপ্রাপ্ত, যে অন্যদের নসীহত করবে তার নিজেরও প্রথমে তা মেনে চলতে হবে। জামাতের সদস্যদের সামনে সেক্রেটারী তরবীয়তের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। জামাতের তরবীয়তের দায়িত্ব, সুশিক্ষার দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত হয়। আমি বেশ কয়েকবার বেশ কয়েক ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি যে, তরবীয়ত বিভাগ যদি কর্মঠ ও সক্রিয় হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য অনেক বিভাগের কাজ নিজ থেকেই সমাধা হতে পারে। জামাতের সদস্যদের তরবীয়তের বা সুশিক্ষার মান যত উন্নত হবে ততই অন্যান্য বিভাগের কাজ সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। যেমন সেক্রেটারী মালের কাজ সহজ হয়ে উঠবে, সেক্রেটারী উমুরে আমার কাজ সহজ হয়ে উঠবে, সেক্রেটারী তবলীগের কাজ সহজ হয়ে যাবে। একইভাবে অন্যান্য বিভাগের কাজও, যেমন কাযা বা বিচার বিভাগের কাজও সহজ হয়ে যাবে। আমি প্রায় সময় বিভিন্ন স্থানে আমেলার মিটিংয়ে বলে থাকি যে, তরবীয়তের কাজ প্রথমে নিজের ঘর থেকে আরম্ভ করুন। আর ঘর বলতে শুধু সেক্রেটারী তরবীয়তের ঘর নয় বরং মজলিসে আমেলার প্রত্যেক সদস্যের ঘরের কথা বলছি। মজলিসে আমেলার নিজেদের তরবীয়তের প্রতি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেয়া উচিত। জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তরবীয়ত যে অনুষ্ঠানই প্রণয়ন করেন, তাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে, আমেলার সদস্যরা সেসব কর্মকান্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত কিনা। আল্লাহ্ তা'লার যেসব মৌলিক নির্দেশাবলী রয়েছে আর মানব সৃষ্টির যে মৌলিক এবং প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে আমেলার সভ্য এবং সদস্যরা সেই দায়িত্ব পালন করছে কিনা। যদি তারা তা না করে থাকে তাহলে তাদের মাঝে তাকওয়া নেই। আল্লাহ্‌র অধিকার সমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো ইবাদত। এর জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে নির্দেশ হলো নামায কায়েম করা। নামায বাজামাত পড়ার মাধ্যমেই নামায কায়েম হতে পারে। সুতরাং আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য ওহদাদার বা

কর্মকর্তাদের উচিত নামাযের হিফাযত করে নামায কায়েম বা নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এর ফলে যেখানে আমাদের মসজিদ আবাদ হবে, নামায সেন্টার আবাদ হবে বা নামাযীতে ভরে যাবে সেখানে তারা খোদার কৃপারাজিও অর্জন করবে। আর এভাবে নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের কল্যাণে জামাতের সভ্য এবং সদস্যদেরও তারা তরবীয়ত করতে পারবে। তারা খোদার ফযল এবং কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবে, তাদের কাজে সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হবে। তারা শুধু কথার খৈ ফুটাবে না। সুতরাং কর্মীদের সর্বপ্রথম আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, তাদের কথা এবং কর্মের মাঝে কতটা মিল এবং সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (সূরা আস্-সাফ্:৩) অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরা কর না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

এই আয়াতই স্পষ্ট করছে যে, পৃথিবীতে কিছু বলে সেই কাজ না করার মানুষ ছিল, আছে এবং থাকবে। আমার কথা ভালোভাবে শ্রবণ কর এবং হৃদয়ে গেঁথে নাও যে, মানুষের কথা ও আলোচনা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে না হয় এবং তাতে যদি ব্যবহারিক শক্তি না থাকে তাহলে তা প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য রাখে না। সদা স্মরণ রেখ, শুধু বড় বড় শব্দ চয়ন আর বুলি আওড়ানো কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ কর্ম বা আমল না থাকবে। আর শুধু কথা খোদার দৃষ্টিতে কোন গুরুত্ব রাখে না।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদার এই নির্দেশ অনুসারে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, **আমাদের কথা এবং কাজে স্ববিরোধ থাকা উচিত নয়।** আর এই কথাকে সামনে রেখে সবচেয়ে বেশি আত্মবিশ্লেষণকারী হওয়া উচিত আমাদের কর্মকর্তাদের। যেখানে দূরত্ব বেশি বা যেখানে গুটি কতক ঘর আহমদী রয়েছে, যেখানে মসজিদ বা নামায সেন্টার নেই সেখানে ঘরেই বাজামাত নামায হতে পারে আর কার্যত এটি অসম্ভব নয়। অনেক আহমদী আছে যারা এটি মেনে চলে। তাদের ওপর রীতিমত কোন দায়িত্ব ন্যাস্ত নেই, তারা আমেলার সদস্যও নন কিন্তু তারা নিজেদের ঘরে চতুর্পাশের আহমদীদের সমবেত করে বাজামাত নামাযের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। যদি সচেতনতা থাকে তাহলে সবকিছু সম্ভব। আর আমাদের প্রত্যেক কর্মকর্তার ভিতর বাজামাত নামাযের এক সচেতনতা থাকা উচিত নতুবা তারা আমানতের দায়িত্ব পালনকারী হবে না, আমানতের প্রতি সুবিচারকারী গন্য হবে না যার প্রতি কুরআনে করীম বারবার নসীহত করেছে। তাই কর্মকর্তাদের সবসময় এই কথা সামনে রাখতে হবে যে, খোদা তা'লা প্রকৃত মু'মিনের চিহ্ন বা লক্ষণ এটি উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদের আমানত এবং অঙ্গীকার পালনে যত্নবান। এই বিষয়ে তারা সচেতন এবং সজাগ দৃষ্টি রাখে। তারা দেখে যে, আমাদের ওপর যেই দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে, আমরা যে খিদমতের বা কাজের অঙ্গীকার করেছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছে না তো। এটি সামান্য কোন বিষয় নয়। খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে এই কথাও বলেছেন যে,

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (সূরা বনি-ইসরাঈল:৩৫) প্রতিটি আহাদ বা অঙ্গীকার সম্বন্ধে একদিন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব ইবাদত একটি মৌলিক বিষয় আর মানব সৃষ্টির

উদ্দেশ্যই এটি। এই দায়িত্ব তো আমাদের পালন করতেই হবে। এক্ষেত্রে কোনভাবে কোন কর্মকর্তার পক্ষ থেকে আলস্য প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয় বরং কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকেও তা প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয়। এছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যার প্রতি ওহদাদারদের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত। আর এসব কথা মানুষের অধিকার আর জামাতের সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের আচার-আচরণ বা আচার-ব্যবহারের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর এই কথাগুলো ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের অঙ্গীকারের সাথেও সম্পর্ক রাখে। কোন ওহদাদার, সে কর্মকর্তা হবে এই ধারণা মাথায় বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হয় না বরং ইসলামে ওহদাদার বা কর্মকর্তা সংক্রান্ত যে ধারণা রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহানবী (সা.) এটি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, জাতির নেতা জাতির সেবক হয়ে থাকে। সুতরাং এক ওহদাদার বা কর্মকর্তা বা পদাধিকারীর মানুষের বিষয়ে নিজের আমানতের প্রতি সুবিচার করা আসলে জাতির সেবক হিসেবে কাজ করার ওপরই নির্ভর করে। আর এটি তখনই সম্ভব যদি মানুষের ভিতর কুরবানী এবং ত্যাগের বৈশিষ্ট্য থাকে। তার মাঝে যদি বিনয় ও নম্রতা থাকে। তার ধৈর্য্যের মান যদি অন্যদের চেয়ে উন্নত হয়। অনেক সময় ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের কথাও শুনতে হয়। যদি শুনতে হয় তাহলে শুনা উচিত। কর্মকর্তা নিজেই যাচাই করতে পারে যে, তার সহ্যের শক্তি কতটুকু রয়েছে। তার বিনয় কোন মানের বা নম্রতা কোন পর্যায়ে রয়েছে। অনেক সময় এমন ওহদাদার বা কর্মকর্তার বিষয়াদিও সামনে আসে যাদের মাঝে বিন্দুমাত্র সহ্যশক্তি নেই বা থাকে না। যদি অন্য কেউ অসৌজন্যমূলক আচরণ করে তাহলে সেই ওহদাদার বা কর্মকর্তাও একই ব্যবহার আরম্ভ করে দেয়। সাধারণ কোন সদস্য যদি অভদ্র বা অশিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এতে সেই ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় না বা তার কিছু যায় আসে না। সর্বোচ্চ এটিই বলা হবে যে, এই ব্যক্তির চরিত্র অত্যন্ত নিম্ন মানের। কিন্তু কর্মকর্তাদের মুখ থেকে যখন মানুষের সামনে নোংরা শব্দ বের হয় তখন ওহদাদার বা কর্মকর্তার নিজের সম্মান এবং মর্যাদারও হানি হয় আর একই সাথে জামাতের সদস্যদের ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। জামাতের যে মান হওয়া উচিত বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে যে মানে দেখতে চান সেই ক্ষেত্রে যদি একটি দৃষ্টান্তও এমন সামনে আসে তাহলে তা জামাতের দুর্নাম হওয়ার কারণ হতে পারে আর হয়ও। আর এমন দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এমনকি মসজিদেও ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যায়। আর শিশুদের এবং যুবক শ্রেণীর ওপর এর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে কি চান আর ত্যাগের উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকারীদের কথা আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে উল্লেখ করেছেন তা দেখুন।

এক জায়গায় তিনি বলেন, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ (সূরা আল্-হাশর:১০) অর্থাৎ মু'মিন তারা যারা নিজেদের ধর্মীয় ভাইদের নিজ প্রাণের ওপর প্রাধান্য দেয়। আনসাররা মুহাজিরদের জন্য এই দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছেন। আর এটিই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। নিজ প্রাণের ওপর প্রাধান্য দেয়া তো বহু দূরের কথা বা অনেক বড় কথা, অনেক সময় অন্যের যে প্রাপ্য আছে তাও পুরোপুরি প্রদান করা হয় না। মানুষের কিছু ঝগড়া-বিবাদ তাদের কাছে অর্থাৎ কর্মকর্তাদের কাছে আসে বা কেন্দ্র হতে রিপোর্ট প্রেরণের জন্য কিছু বিষয় পাঠানো হলে অনেক অসাবধানতার সাথে রিপোর্ট

প্রেরণ করা হয়। সঠিকভাবে তদন্ত না করেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়া হয়। বা বিষয়কে এতটা দীর্ঘ সূত্রিতার মুখে ঠেলে দেয়া হয় যে, কোন অভাবীর অভাব মোচন সংক্রান্ত যদি কোন আবেদন পত্র আসে তাহলে সময়মত রিপোর্ট না আসার কারণে সেই অভাবীর ক্ষতি হয়ে যায় বা তাকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন কর্মকর্তা ব্যস্ততার অজুহাতও দেখিয়ে থাকে। আর কারো কারো কাছে কোন অজুহাত থাকে না, শুধু অমনোযোগই এর মূল কারণ। যদি তাদের নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হয় বা কোন নিকটাত্মীয়ের বিষয় হয় তখন তাদের প্রিফারেন্সেস বা পছন্দের মানদন্ড বদলে যায়। সুতরাং প্রকৃত কুরবানী এবং ত্যাগের প্রেরণা, আমানতের প্রতি সত্যিকার অর্থে সুবিচার করা বা শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অর্থ হলো এক গভীর সচেতনতার সাথে অন্যের কাজে আসা। ত্যাগের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আর অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে যদি কাজ করা হয় তাহলে জামাতের সাধারণ সদস্যদের কুরবানী ও ত্যাগের মানও উন্নত হবে। পরস্পরের অধিকার খর্ব করার পরিবর্তে অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আমরা অমুসলিমদের সামনে বলে থাকি যে, পৃথিবীতে শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যদি সকল পর্যায়ে অধিকার কুক্ষিগত করার পরিবর্তে অধিকার দেয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। কিন্তু আমরা নিজেরাই যদি এই মানে উপনীত না থাকি তাহলে আমরা এমন একটি কাজ করব যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হবে।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা বিশেষভাবে কর্মকর্তাদের মাঝে থাকা উচিত তা হলো বিনয়। আল্লাহ্ তা'লা রহমান খোদার বান্দাদের যেই পরিচয় কুরআনে তুলে ধরেছেন তা হলো يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (সূরা আল্-ফুরকান:৬৪) তারা ভূপৃষ্ঠে বড় বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। এরও উন্নত দৃষ্টান্ত আমাদের ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের মাঝে পরিদৃষ্ট হওয়া উচিত। যে যত বড় পদে নিযুক্ত হবে তার ততই সেবার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে মানুষের সাথে সাক্ষাতে বিনয় প্রদর্শন করা উচিত আর এটিই প্রকৃত বড় হওয়া। মানুষ অবলোকন করে আর অনুভবও করে যে, কর্মকর্তার আচরণ কেমন। অনেক সময় মানুষ আমাকে লিখেও পাঠায় যে, অমুক কর্মকর্তার আচরণ সাধারণত এমন কিন্তু আজকে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, সেই ওহদাদার বা কর্মকর্তা আমাকে শুধু সালামই করেনি বরং আমি কেমন আছি তাও জিজ্ঞেস করেছে এবং খুব সুন্দর ব্যবহার করেছে। তার আচার-আচরণ দেখে আমার ভালো লেগেছে। আর এতে সেই কর্মকর্তা যে বড় সেটিই প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই এমন যারা কর্মকর্তাদের স্নেহপূর্ণ এবং কোমল ও নমনীয় আচরণেই সন্তুষ্ট হয়ে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়। যদি কোন কর্মকর্তার হৃদয়ে নিজের পদের অহংকারে কোন প্রকার আত্মম্ভরিতা বা গর্ব দানা বাধে তাহলে তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, এই অভ্যাস খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আর মানুষ যদি খোদা থেকে দূরে সরে যায় তাহলে তার কাজে কোন প্রকার বরকত বা কল্যাণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং ধর্মের কাজ সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। খোদার সন্তুষ্টিই যদি না থাকে তাহলে এমন ব্যক্তি জামাতের জন্য কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

তাই ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের সবসময় এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তাদের মাঝে বিনয় এবং নম্রতা আছে কিনা। আর যদি থেকে থাকে তাহলে কতটা। রসূলে

করীম (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যত বেশি বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করে খোদা তাকে ততই মহান মর্যাদায় ভূষিত করেন। তাই প্রত্যেক কর্মকর্তার স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা যদি তাকে জামাতের সেবার সুযোগ দিয়ে থাকেন তাহলে এটি খোদার একান্ত অনুগ্রহ। আর এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজের মাঝে অধিক বিনয় এবং নম্রতা সৃষ্টি হওয়া। যদি তা না হয় তাহলে খোদার এহসান বা অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয় না। অনেক সময় দেখা গেছে যে, মানুষ সাধারণ অবস্থায় সাক্ষাত করতে গিয়ে পরম বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে, মানুষের সাথে সুন্দরভাবে সাক্ষাত করে। কিন্তু নিজের অধীনস্ত বা সাধারণ মানুষের সাথে যখন কোন কর্মকর্তার মতভেদ হয় তখন তাৎক্ষনিকভাবে তাদের কর্মকর্তাসুলভ যেই অহংকার আছে তা জাগ্রত হয় আর বড় কর্মকর্তা হওয়ার আত্মম্ভরিতায় পুনরায় নিজের অধীনস্তের সামনে আত্মম্ভরিতাপূর্ণ আচরণ প্রকাশ পায়। বিনয় এটি নয় যে, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি আপনার সামনে জ্বি হুজুর জ্বি হুজুর করবে বা মতভেদ করবে না ততক্ষণ আপনি বিনয় প্রকাশ করবেন। এটি কৃত্রিম বিনয়। প্রকৃত চিত্র বা প্রকৃত রূপ তখন প্রকাশ পায় যখন মতভেদ দেখা দেয়। অধীনস্ত যখন কোন কর্মকর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলে তখন সেই মতামতকে সত্যিকার অর্থে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং এই বিনয়ের মাধ্যমে বড় মনোবলেরও প্রমাণ পাওয়া যায় আর এমনটি হলেই এই বিনয় সত্যিকার বিনয় গন্য হবে। ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের সবসময় খোদার এই নির্দেশ সামনে রাখা উচিত যে, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (সূরা লুকমান:১৯) অর্থাৎ আর রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষের সামনে গাল ফোলাবে না এবং পৃথিবীতে অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে না। আমি মতভেদের কথা বলেছি। এ সম্পর্কে আমি এটিও স্পষ্ট করতে চাই যে, জামাতের নিয়ম-কানুন বা রুলস-রেগুলেশন আমীরকে এই অধিকার প্রদান করে যে, কোন কোন সময় আমেলার পরামর্শের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছা অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু সব সময় সবাইকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা উচিত আর পরামর্শের ভিত্তিতে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত এবং কাজ হওয়া উচিত। অনেক সময় আমীররা এই সুযোগকে প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে ব্যবহার করে। এই সুযোগ বা এই অধিকার চরম পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা উচিত, যেখানে জানা থাকে বা যেখানে স্পষ্ট হয় যে, এতেই জামাতের স্বার্থ নিহিত আর সেখানে আমেলার সামনেও এটি স্পষ্ট করা উচিত। জামাতের বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে এমনটি হওয়া উচিত। আর এরজন্য দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্যও যাচনা করা উচিত। শুধু নিজের বিবেক ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রেসিডেন্টদের এই অধিকার বা এই সুবিধা নেই, এমনকি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হলেও না। আমেলার মতামতকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে নিজের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করার সেই অধিকার প্রেসিডেন্টের নেই। নিজ নিজ কর্ম গন্ডি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য কর্মকর্তাদের উচিত হবে রুলস-রেগুলেশন পাঠ করা এবং বুঝা। তারা যদি রুলস-রেগুলেশন এবং জামাতের নিয়ম-কানুন অনুসারে কাজ করে তাহলে অনেক ছোট ছোট সমস্যা যা আমেলার মাঝে বা জামাতের সদস্যদের জন্য অস্বস্তির কারণ হয় তা আর সামনে আসবে না।

আরেকটি বিশেষত্ব যা কর্মকর্তাদের থাকা উচিত তা হলো অধীনস্তদের সাথে সুন্দর এবং সদ্ব্যবহার করা। জামাতের বেশিরভাগ কাজ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। জামাতের সভ্য এবং সদস্যরা জামাতের কাজের জন্য নিজেদের সময় দিয়ে থাকে। তারা সময় দেন কেননা তারা খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানী, তারা সময় দেন কেননা জামাতের সাথে তাদের সুসম্পর্ক এবং ভালোবাসা রয়েছে। সুতরাং ওহদাদার বা কর্মকর্তাদেরও সহকর্মীদের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশও এটিই। সদ্ব্যবহার বা সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের নায়েব এবং অধীনস্তদের কাজ শিখানোর চেষ্টা করা উচিত, যেন জামাতী কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য সব সময় কর্মী বাহিনী সামনে আসে বা আসতে থাকে। জামাতের কাজ আল্লাহ্ তা'লা নিজেই পরিচালিত করে থাকেন কিন্তু যদি কর্মকর্তা বা ওহদাদার, যারা কাজের অভিজ্ঞতা রাখে, তারা যদি কর্মী বাহিনীর দ্বিতীয় লাইন প্রস্তুত করেন তাহলে তারা এই কাজের জন্যও পুরস্কার পাবেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার বা পূর্বের কোন খলীফার কখনও এই চিন্তা হয়নি যে, জামাতের কাজ কিভাবে চলবে? এ সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি ইনশাআল্লাহ্ নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনীর যোগান দিতে থাকবেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর যুগে এক কর্মকর্তার ধারণা ছিল যে, আমার বুদ্ধিমত্তা, কর্মপন্থা আর পরিশ্রমের কারণে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। এই কথা যখন খলীফা সালেস (রাহে.)-র কর্ণগোচর হয় তখন তিনি প্রথম ব্যক্তিকে অপসারণ করে এমন এক ব্যক্তিকে সেই কাজে নিযুক্ত করেন যার অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের আদৌ কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এটি যেহেতু খোদার কাজ আর খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে খোদার যে ব্যবহার হয়ে থাকে সে কারণে সেই নতুন কর্মকর্তা যিনি কিছুই জানতেন না তার কাজে এতটা বরকত সৃষ্টি হয় যা পূর্বে কখনও ভাবাও যেত না। সুতরাং কর্মকর্তাদের আসলে খোদা তা'লাই কাজের সুযোগ দেন। জামাতী কর্মীদের খোদা তা'লাই খিদমতের সুযোগ দেন। যারা ওয়াকেফে জিন্দেগী তাদেরকে জামাত এবং ধর্মের সেবা করে খোদার কৃপাভাজন হওয়ার সুযোগ আল্লাহ্ তা'লাই দেন, নতুবা কাজ তো আল্লাহ্ তা'লাই করছেন কেননা এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি। তাই কারো মাথায় এই ধারণা জাগ্রত হওয়া উচিত নয় যে, আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার জ্ঞান জামাতের কাজ পরিচালিত করছে বা জামাতের কাজ করছে বা আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার জ্ঞান জামাতের কাজ সমাধা করতে পারে বা চালাতে পারে। খোদা তা'লার ফযল বা কৃপাই জামাতের কাজ চালাচ্ছে বা করছে। আমাদের অনেক দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি আর ঘাটতি এমন রয়েছে যে, যদি ইহজাগতিক কাজ হয় তাহলে তাতে সেই বরকত দেখা দিতেই পারে না এবং সেই ফলাফল প্রকাশ পেতেই পারে না। কিন্তু খোদা তা'লা দুর্বলতা ঢেকে রাখেন আর স্বয়ং ফিরিশতাদের মাধ্যমে তিনি সাহায্য করেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ তবলীগের কাজকেই নিন। এক্ষেত্রে এই পাশ্চাত্যেই আল্লাহ্ তা'লা এমন কর্মী বাহিনী দিয়েছেন যারা এখানেই বড় হয়েছে। এমন যুবক কর্মী বাহিনী আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন যারা ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান অর্জন করার পর বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে। তারা এমনভাবে উত্তর দেয় যে, শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে যায়। এছাড়া অনেক যুবক এমন আছে যাদের এমন উত্তরে বিরোধীরা লেজ গুটিয়ে পালানো ছাড়া অন্য কোন উপায় বা রাস্তা খুঁজে পায় না। সুতরাং ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের ধর্মের খিদমতের সুযোগকে খোদার কৃপা জ্ঞান করা উচিত। নিজের কোন অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতাকে এর কারণ মনে করা উচিত নয়।

এরপর কর্মকর্তাদের মাঝে আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা থাকা উচিত তাহলো, হাস্যোৎফুল্লতা এবং সুন্দর ব্যবহার করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (সূরা আল্-বাকারা: ৮৪) অর্থাৎ মানুষের সাথে

কোমল আচরণ কর এবং উত্তম ব্যবহার কর। অতএব এটিও একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের মাঝে অনেক বেশি থাকা উচিত। যখনই অধীনস্তদের সাথে এবং সহকর্মীদের সাথে কথাবার্তা বলেন বা অনুরূপভাবে অন্যদের সাথে যখন কথা বলেন তখন তাদের এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত যে, তাদের পক্ষ থেকে যেন উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। অনেক সময় প্রশাসনিক কারণে কঠোর ভাষায় কথা বলতে হয় বা বলার প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্তু এটি কেবল চরম পরিস্থিতিতে হতে পারে। যদি ভালোবাসার সাথে কাউকে বুঝানো হয়, কর্মকর্তা বা ওহদাদারগণ যদি মানুষের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত করে যে, আমরা তোমাদের প্রতি সহানুভূতি রাখি, তাহলে শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ এমন যারা বিষয় বুঝে যায় এবং সহযোগিতায় সম্মত হয়ে যায়। এর কারণ হলো জামাতের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো মানুষের মাঝে এই সচেতনতা সৃষ্টি করা বা মানুষের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়া যে, ওহদাদার বা কর্মকর্তা বা পদাধিকারীরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মানুষের সাথে কোমলতার সাথে কথা বলুন। কোন ভুল-ভ্রান্তির কারণে শুরুতেই এত কঠোরভাবে ধৃত করবেন না যে, অন্য ব্যক্তি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করারই সুযোগ পাবে না, এমনটি যেন না হয়। হ্যাঁ, যারা অভ্যস্ত অপরাধী, যারা বার বার ভুল করে, বার বার ফিতনা এবং অশান্তির কারণ হয়, তাদের সাথে অবশ্যই কঠোর ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু এর জন্যও পুরো তদন্ত হওয়া আবশ্যক। আর একই সাথে এই যে কঠোরতা তা যেন কোনভাবেই ব্যক্তিগত শত্রুতায় পর্যবসিত না হয় বরং যদি সংশোধনের উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবহার করতে হয় তাহলেই তা করা উচিত। মহানবী (সা.) একবার তাঁর নিজের নিযুক্ত ইয়ামেনের গভর্নরকে নসীহত করেন যে, মানুষের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি কর, কাঠিন্য নয়, ভালবাসা এবং আনন্দের প্রসার কর, ঘৃণার বিস্তার যেন না হয়। অতএব এটি এমন নসীহত যা ওহদাদার বা কর্মকর্তা ও জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের আন্তঃসম্পর্কের মাঝে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আর এর ফলে জামাতের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার প্রেরণা এবং চেতনাবোধ জাগ্রত হবে।

তাই কর্মকর্তাদের ওপর এটি অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়, বিশেষ করে আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং তরবিয়ত বিভাগ আর সিদ্ধান্তকারী বা রায় প্রদানকারী বিভাগের দায়িত্ব হলো মানুষের জন্য সহজসাধ্যতার পন্থা সন্ধান করা। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখবেন যে, খোদার নির্দেশের গন্ডির মাঝে থেকে এই রীতি অনুসরণ করতে হবে। দুনিয়াদার বা দুনিয়ার কীটদের মত নয় যারা সহজ সাধ্যতা সৃষ্টির জন্য খোদার নির্দেশাবলীকে অবজ্ঞা করে থাকে। শরীয়তের চতুর্সীমার মাঝে থেকে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করে বান্দাদের প্রাপ্যও দিতে হবে আর নিজেদের অঙ্গীকার এবং আমানতেরও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আমি যেভাবে বলেছি যে, রুলস এবং রেগুলেশনের বই বা নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত বই সবার দেখা উচিত। নিজের বিভাগের সংশ্লিষ্ট কাজের জ্ঞান অর্জন করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির জানা উচিত যে, তার কাজের সীমা-পরিসীমা কতটুকু। অনেক সময় অনেক কর্মকর্তা তাদের কাজের সীমার জ্ঞানই রাখে না। এক বিভাগ একটি কাজ করে অথচ রুলস-রেগুলেশনে বা নিয়ম-কানুনে সেই কাজের দায়িত্ব হলো অন্য বিভাগের। অথবা অনেক সময় দু'বিভাগের কাজের পার্থক্য এত সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যে, চিন্তা না করেই দু'টো বিভাগ একটি অন্যটির গন্ডিতে নাক গলানো আরম্ভ করে। সম্প্রতি এখানে যুক্তরাজ্যের মজলিসে আমেলার সাথে আমার মিটিং হয়েছে, সেখানে আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই সূক্ষ্ম পার্থক্য না বুঝার কারণে বিনা কারণে বা অযথা বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়। যদি রুলস-রেগুলেশন পড়া হয় তাহলে এভাবে সময় নষ্ট হওয়ার কথা নয়। যেমন তবলীগ বিভাগের তবলীগি পরিকল্পনাও হাতে নিতে হবে এবং যোগাযোগও

করতে হবে বা রাবেতা করতে হবে আর যোগাযোগ ও রাবেতার মাধ্যমে তবলীগের কাজ প্রসারতা লাভ করবে। অনুরূপভাবে উমুরে খারেজা বিভাগও রয়েছে, তাদেরকেও যোগাযোগ করতে হয় এবং জামাতকে পরিচিত করতে হয়। উভয়টির গন্ডি পৃথক। এক বিভাগ তবলীগি উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করবে আর দ্বিতীয় বিভাগ যোগাযোগ করবে গণযোগাযোগের মানসে, সম্পর্কের গন্ডিকে প্রসারিত করা হবে তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো জামাতের পরিচিতি এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে পথের দিশা দেয়া যেন মানুষকে এক আল্লাহ্‌র দিকে এনে তাদের ইহ এবং পরকালকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি। আর পৃথিবী যে শান্তির জন্য হাহাকার করছে সেদিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বাহবা নেয়া বা কুড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যদি এই বিভাগগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে তাহলে বহুগুণ বেশি ফলাফল আসতে পারে।

এরপর অনেক জায়গা থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গীও প্রকাশ করা হয় যে, বিভিন্ন বিভাগের বাজেট সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয় না। প্রত্যেক বিভাগের বাজেট যা শূরায় পাশ হয়ে থাকে তা দেয়া উচিত আর সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীর সেই বাজেট খরচের অধিকারও থাকা উচিত। হ্যাঁ, সেক্রেটারীর সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা আমেলায় উপস্থাপন করা আবশ্যক হবে এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে খরচ হতে হবে আর প্রত্যেক কাজের অগ্রগতির কথা প্রত্যেক মিটিং-এ খতিয়ে দেখা উচিত আর কাজের পরিকল্পনায় যদি কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় বা কারো মনোযোগ যদি উন্নতি, অগ্রগতি বা প্রোগ্রেসের প্রতি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তা নিয়েও চিন্তা করা উচিত বা ভাবা উচিত।

এরপর আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং জামাতী সেক্রেটারীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, কেন্দ্র থেকে যখন কোন দিক-নির্দেশনা বা সার্কুলার আসে তখন তাৎক্ষণিকভাবে পুরো মনোযোগসহকারে সেগুলোকে কাজে রূপায়িত করা উচিত এবং জামাতের মাধ্যমে করানো উচিত। কোন কোন জামাত সম্পর্কে অভিযোগ আসে যে, কেন্দ্রীয় দিক-নির্দেশনার ওপর পুরোপুরি আমল করা হয় না। কোন দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে কোন বিশেষ দেশ বা জামাতের দেশীয় কোন কারণে যদি দ্বিধাদ্বন্দ থাকে তাহলেও তাদের তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনের প্রস্তাব করা উচিত। আর এ কাজ জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্টের কাজ। কিন্তু কোনভাবেই যা বৈধ নয়, যা যুক্তিযুক্ত নয়, তাহলো নিজের বুদ্ধির ভিত্তিতে সেই দিক নির্দেশনাকে এক পাশে চাপা দিয়ে রাখা, আর তার ওপর আমল না করানো আর কেন্দ্রকেও অবহিত না করা। কোন আমীর বা প্রেসিডেন্ট-এর এমন আচরণ কেন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞাসূচক আচরণ হিসেবে গণ্য হবে। আর এ প্রসঙ্গে কেন্দ্র তখন ব্যবস্থাও নিতে পারে।

মুসী বা ওসীয়্যতকারীদের সম্পর্কেও আমি এখানে বলতে চাই, ওসীয়্যতকারীদের প্রথম কথা হিসেবে স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজেদের চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা বা এর হিসাব রাখা প্রত্যেক মুসীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কিন্তু কেন্দ্রীয় অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীরও দায়িত্ব হলো প্রত্যেক মুসীর হিসাব কমপ্লিট বা সম্পূর্ণ রাখা আর প্রয়োজনে তাদেরকে স্মরণ করানো যে, তাদের চাঁদার প্রকৃত পরিস্থিতি বা স্থিতি কি। দেশীয় জামাতের কাজ হলো স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারীদের এ্যাক্টিভ করা বা সক্রিয় করা যেন প্রত্যেক মুসীর সাথে তাদের যোগাযোগ থাকে। অনেক সময় দেখা গেছে যে, কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয় আর সে ব্যক্তি ওসীয়্যতকারী হয়ে থাকে, আর রিপোর্টে লিখে দেয়া হয় যে, এই ব্যক্তি এত দিন থেকে ওসীয়্যতের

চাঁদা দেয় নি। যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, ওসীয়্যতের চাঁদা যদি না দিয়ে থাকে তাহলে তার ওসীয়্যত কিভাবে বহাল রইল, তখন তদন্তে দেখা যায় যে, ওসীয়্যতকারীর কোন দোষ ছিল না, সে চাঁদা দিয়েছে ঠিকই কিন্তু যারা রেকর্ড রাখে তারা অফিসে সঠিক রেকর্ড রাখে নি। এমন রিপোর্ট বিনা কারণে ওসীয়্যতকারীর জন্য ব্যতিব্যস্ততা এবং অস্বস্তির কারণ হয়। দ্বিতীয়ত জামাতি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতারও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এখন সঠিক হিসাবের ব্যবস্থা রয়েছে, কম্পিউটারাইজড সিস্টেম রয়েছে। সব কিছু এখন নিয়মতান্ত্রিক। এখন এমন ভুল-ভ্রান্তি হওয়া উচিত নয়। সব দেশের সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং সেক্রেটারী মালের উচিত দেশের সকল সেক্রেটারী মাল এবং সেক্রেটারী ওসীয়্যতকে কর্মঠ করা বা সক্রিয় করা আর জামাতের আমীরদেরও কাজ হলো বিভিন্ন সময় এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা। শুধু চাঁদা একত্রিত করা আর এরপর এর রিপোর্ট দেয়াই তাদের কাজ নয় বরং এই ব্যবস্থাপনাকে, এই সিস্টেমকে নির্ভরযোগ্য করে তোলা আর কেন্দ্র এবং স্থানীয় জামাতগুলোর মাঝে সুদৃঢ় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করাও আমীরদের কাজ।

অনুরূপভাবে মুবাল্লেগীন এবং মুরব্বীদের প্রেক্ষাপটেও আমি একটি কথা বলতে চাই, কোন কোন স্থানে জামাতের মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদের রীতিমত মিটিং হয় না। মুবাল্লিগ ইনচার্জ রীতিমত মিটিং করার জন্য দায়ী হবেন। জামাতী, তরবিয়তী ও তবলিগী কাজেরও সঠিক চিত্র তাদের সামনে থাকা চাই। কেউ যদি ভাল কাজ করে তাহলে তার সম্পর্কে সেখানে মত বিনিময় হওয়া উচিত এবং সেই উন্নত কাজের জন্য যেই রীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা থেকে যেন অন্যরাও উপকৃত হতে পারে সেই ব্যবস্থাও হাতে নেয়া উচিত। অনুরূপভাবে জামাতের সেক্রেটারীরা বিভিন্ন জামাতকে যে দিক-নির্দেশনা দেয় বা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন জামাতকে যে দিক-নির্দেশনা পাঠানো হয় সে সম্পর্কেও রিপোর্ট দিন। মুরব্বীদের এটিও দেখা উচিত যে, সব জামাতে এই প্রেক্ষাপটে কতটা কাজ হয়েছে। যেখানে সেক্রেটারীরা সক্রিয় নয় বা এ্যাক্টিভ নয় বিশেষ করে তবলীগ, তরবিয়ত এবং আর্থিক বিষয়ে সক্রিয় নয় সেখানে মুরব্বী/মুয়াল্লেমদের উচিত তাদের স্মরণ করানো। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কর্মকর্তাদের তৌফিক দিন, আগামী তিন বছরের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে খিদমতের যে সুযোগ করে দিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে তারা যেন নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারে, নিজেদের প্রতিটি কথা এবং কর্মের ক্ষেত্রে জামাতের জন্য তারা যেন অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মোহতরমা সাহেবযাদী তাহেরা সিদ্দিকা সাহেবার যিনি মির্যা মুনীর আহমদ সাহেব-এর স্ত্রী ছিলেন। ২০১৬ সনের ১৩ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত নওয়াব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব এবং নওয়াব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন, হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের পৌত্রী এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৌহিত্রী, আর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব-এর পুত্র বধু ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন এবং ৯৫ বছর আয়ু লাভ করেন। তিনি কাদিয়ানে মেট্রিক পর্যন্ত প্রাথমিক পড়ালেখা করেন। হযরত আম্মাজান (রা.) তাকে কন্যা বানিয়ে রেখেছিলেন, বিশেষ স্নেহ এবং ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তার সাথে। জেহলামে জনাব সাহেবযাদা মির্যা মুনীর আহমদ সাহেব-এর সাথেই ছিলেন। জেহলামে জনাব মুনীর আহমদ সাহেবের চিপ বোর্ড ফ্যাক্টরী ছিল যা কয়েক মাস পূর্বে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মরহুমা লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবেও সেখানে কাজ করেছেন। ১৯৭৪ সালে যখন সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় তখন জেহলাম জামাতের বিরাট অংশ চিপ বোর্ড ফ্যাক্টরীতেই সমবেত হয়। তিনি সেই

যুগে জামাতের সদস্যদের খুব সুন্দর আতিথ্য করেন। তার এক কন্যা আমাতুল হাসীব বেগমের বিয়ে হয়েছে জনাব মির্যা আনাস আহমদ সাহেবের সাথে যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর পুত্র, আরেক পুত্রের নাম হলো মির্যা নাসির আহমদ সাহেব যিনি জেহলামের আমীরও ছিলেন। ফ্যাক্টরীর ঘটনার পর তাকে জেহলাম ত্যাগ করতে হয়েছে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জামাতা মির্যা সফির আহমদ সাহেবও তার পুত্র। মরহুমা খুবই উন্নত স্বভাবের অধিকারিণী, হাসি-খুশী ও মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। ধৈর্য্যশীলা, কৃতজ্ঞ, ইবাদতগুজার মহিলা ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। আর্থিক বিভিন্ন তাহরীকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। আতিথেয়তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং জামাতের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখতেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বা খিলাফতের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বাঁধা দিতেন। আমি যেভাবে বলেছি হযরত আম্মাজান তাকে কন্যা হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। হযরত আম্মাজান নিজের বিয়ের এবং ব্যক্তিগত অনেক জিনিস তাকে দিয়ে গেছেন যাতে হযরত আম্মাজানের নামও লিখা আছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার প্রতি মাগফিরাত করুন, দয়াদ্র হোন, তার সন্তান-সন্ততিকেও তার পুণ্যের ওপর পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দিন এবং সব সময় খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।